International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.30-38
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.30-38

উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতা ও উত্তর আধুনিক ভাবনা

সুবীর বসাক
সহকারী অধ্যাপক, অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা, ভারত

ড. মলয় দেব
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যমণিনগর, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Modernity entered somewhat late Bengali poetry of North Bengal. Pre-independence Bengali poetry emulated Rabindranath's poetry. In the 1950s poets of North Bengal were grappling with the complexities of life. The dismemberment by partition took place before the wounds of World War II and humanity were healed. The much-desired freedom was achieved in deep disappointment. The cry of displaced people and, their life in the shelter of refugee camps, the colonization of colonies built in a head-to-head fight, lack of food, daily life of the landless peasants with no means to pay debts of the landlords, death of the tea workers caused by starvation endangered northern poets. As a result, Bengali poetry of the sixties and seventies of North Bengal epitomized contemporary social reality.

North Bengal poetry of the eighties and nineties also absorbed the ideas of modern theory. Thinkers like Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, Levi Strauss etc. have influenced the world of poets. Roland Barthes announced the death of the writer and the text influenced, so to say, the text of Ferdinand de Saussure. As a result, a different type of speech was developed in the text of the poems of. Saussure Lang and Parol; The concept of symbols and significance which he presented played an important role in the field of literary criticism and creativity. Jacques Lacan's philosophy of alienation, Michel Foucault's world of thought, Jean Badrilla's concept of commodification, Jacques Derrida's theory of deconstruction, Noam Chomsky's universal linguistics have built different schools of thought in modern thought. As a result, the poetry of North Bengal in the 8th and 9th decades moved forward with the richness and diversity of postmodernism. The concerned article will deal with how the postmodern ideas are active in the poetry of some poets like Samar Roychowdhury, Bijay Dey, Shyamal Singh, Bikash Sarkar and so on.

Keywords: Colonization, symbols, significance, dismemberment, modernity, post modernity, humanity.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং রাবীন্দ্রিক ভাবনা বিরোধী আধুনিক কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন দীপ্তি ত্রিপাঠি তা মনে রেখেই বলতে চাই উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবেশ ঘটেছে কিছুটা দেরিতে। এখানকার স্বাধীনতা পূর্বের বাংলা কবিতায় ছিল রবীন্দ্রানুসরণ। রবীন্দ্রবলয়ের কবিগোষ্ঠীর রোম্যান্টিক ভাবনায় মজেছিল এখানকার কবিকুল। পাঁচের দশকের জলপাইগুড়ি জেলার কবি সুরজিৎ

দাশগুপ্ত যিনি ‘জলার্ক’ পত্রিকার সম্পাদক, জীবনানন্দের সাথে ছিল যার নিকট সম্পর্ক এবং কবিতার পালাবদল সম্পর্কে ছিলেন ওয়াকিবহাল একটি স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন— “আমরা যখন ‘জলার্ক’ বের করা শুরু করি তখন আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে জলপাইগুড়ির তরুণ-তরুণীর তথা মধ্যবিত্ত সমাজের মনে ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল, চেতনা ছিল খুবই দুর্বল। আসলে আধুনিকতা, নাগরিকতা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি সাহিত্যিক লক্ষণগুলি জলপাইগুড়ির জীবনে তখনও পরিস্ফুট হয়নি।”[১]

উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছে কিছুটা দেরিতে। এর প্রধান কারণ উত্তরবঙ্গের স্থিতিশীল জীবনপ্রবাহ। পরাধীনতার মর্মবেদনা, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ-আইনঅমান্য আন্দোলন, চৌরিচৌরার নৃশংসতা প্রভৃতি ঘটনার সামাজিক অভিঘাতের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, হতাশা, আস্থাহীনতা ইত্যাদি ভালো-মন্দের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা জীবনবোধ কলকাতার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে যতটা ক্রিয়াশীল ছিল উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তা ছিল অনেকটাই নিস্ক্রিয়। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় খুব দ্রুত আধুনিকতার প্রবেশ ঘটে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন-যন্ত্রণা ইত্যাদি ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় খুব দ্রুত উত্তরবঙ্গের সামাজিক কাঠামোয় বদল ঘটতে থাকে। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের প্রভাব সেই সময় উত্তরবঙ্গের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহে ঢেউ তোলে। সেই প্রবাহে আবির্ভূত কবিকুলের পক্ষে পূর্ববর্তী রোম্যান্টিক কবিতাধারায় মগ্ন থাকা সম্ভব ছিল না। সময়ের পরিবর্তিত অবস্থাকে গ্রহণ করে এবং তাকে আঘাত করবার দ্বান্দ্বিকতায় জন্ম নিল এখানকার আধুনিক বাংলা কবিতা।

ছয় ও সাতের দশকের উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতা সমসাময়িক ঘটনাবলীর অভিঘাত প্রকাশেই অধিক পরিমানে নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনতা-দেশভাগ ও তার ফলশ্রুতিতে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল দিন দিন বেড়েই চলেছিল। সাতের দশকের শুরুতেই তার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে প্রাণে বাঁচার তাগিদে দেশত্যাগের প্রবণতা এই সময় আরো বৃদ্ধি পায়। উদ্বাস্তু মানুষের জীবনসংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনির পাশাপাশি অধিকার ছিনিয়ে নেবার সংগ্রামে উত্তাল হয়ে ওঠে এতদঞ্চলের রাজনীতি। আকস্মিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যহীনতা, দ্রব্যমূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, চোরাকারবারি— এককথায় সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনতায় রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। পাশাপাশি নকশাল আন্দোলন, ঘনঘন প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর, জরুরী অবস্থা ইত্যাদি ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও অভিব্যক্তিতেই অতিক্রান্ত হয়েছে সাতের দশকের দিনগুলি। সমাজবাস্তবতাকে অধিক পরিমানে কাব্যদেহে ধারণ করতে গিয়ে উক্ত দশকের কবিতা হয়ে পড়েছে স্মার্ট সাংবাদ সুলভ। সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার শ্লোগান নিয়ে অনেকেই কবিতাকে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে কবিতার শরীর থেকে নন্দনতত্ত্বের আভরণ খসে পড়ে কঙ্কালসার জীর্ণ চেহারা বেড়িয়ে পরেছে অনেক ক্ষেত্রেই। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ভট্টাচার্য, তুহিন দাশ, ত্রিদিব গুপ্ত, নীরদ রায় প্রমুখদের কবিতা পড়লে সহজেই চোখে পড়ে দহনকালীন সময়ের অভিঘাত।

আটের দশকে আধুনিকোত্তর সময়ে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় বিষয়ের সাথে সাথে শৈলীও কোনো নির্দিষ্ট পরিসীমায় আবদ্ধ থাকেনি। আসলে আধুনিকোত্তর কবিচেতনা স্থির কোনোকিছুতেই তার বিশ্বাসের তলটিকে খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান-দর্শন-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির পরেও মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না। একদিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের মহাজাগতিক ঘটনাবলীর চিত্র উন্মোচিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত নিপীড়িত মানুষের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবল বৈপরীত্যময় এই জাতীয় ঘটনাবলী সচেতন

কবিসত্তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির গৌরব গাঁথা আর সংশয়হীনভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য যেভাবে নবজাগরিত চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, সেখানে আধুনান্তিক কবিকুলের পক্ষে আধুনিকোত্তর সংস্কৃতিকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

আটের দশক থেকে উত্তরের কবিতায় মানুষের বিপন্নতার কথা প্রবলভাবে উঠে আসতে থাকে। এই প্রবণতা কল্লোলকালের বিপন্নতা বোধের থেকেও তীব্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কল্লোলের কালে জীবনযন্ত্রণার হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছিল বিপন্নতাবোধ। মধ্যবিত্তসুলভ জীবনযন্ত্রণা এবং দারিদ্রের বোধই সেখানে মুখ্য ছিল কিন্তু আটের দশক থেকে শুরু হওয়া মানসিক স্থিতিহীনতার পশ্চাতে রয়েছে ভোগবাদ ও প্রযুক্তির দৌরাত্ম্য। অত্যাধিক প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে মানুষের সক্ষমতা যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি বহুজাতি সংস্থাগুলির নিত্যনতুন পণ্যের সমাহারে গগনচুম্বী প্রত্যাশার জন্ম দিচ্ছে। ফলে মানুষ তার স্বীয় আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই জীবনের মুখ্য করে তুলছে। আর তা করতে গিয়েই তাকে যাবতীয় চতুরতার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আটের কবিরা যেহেতু সাতের পরবর্তী সংকটে আক্রান্ত হয়েছেন তাই তাঁদের রচনায় উঠে এসেছেন সমকালীন শূন্যগর্ভ ভাষাচিহ্ন। পূর্বাপর মানবিক ঐতিহ্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, প্রেম ও প্রকৃতি— সবকিছুই প্রবলভাবে সংশয়াক্রান্ত এবং পুনর্বিবেচনাযোগ্য হয়ে উঠলো তাঁদের ভাষাবিশ্বে। পাশাপাশি বিষয়-নির্দিষ্ট যৌক্তিক ক্রমানুযায়ী কবিতা বিন্যাসের রীতিটিও পরিত্যাজ্য হলো। বিষয় কেন্দ্রিকতার অভাবে কবিতার শৈলীও হয়ে পড়লো পরম্পরারহিত।

সাতের দশকের মাঝামাঝি বিজয় দে'র (১৯৫১) কবিতাচর্চার শুরু। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার সময় বিজয় দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'পাগলাঘোড়া' পত্রিকা। তার অল্প কিছু পরে সমর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ক্রুসেড' পত্রিকা। এই দুই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহরে আবির্ভাব ঘটলো যে তিনজন কবির, তাঁরা হলেন বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী এবং শ্যামল সিংহ। তাঁরা পারস্পর ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অথচ কবিতায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। বিজয় দে'র এই পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— 'হে থুতু হে ডাকটিকিট' (১৯৮৫), 'কাঠুরিয়া আন্তর্জাতিক' (১৯৯৪), 'বম্বে টকি' (২০০০), 'বাবলি বাগান' (২০১৫), 'জঙ্গলসূত্র' (২০১৬), 'কামরাঙা এবং ট্রামলাইন' (২০১৬), 'হাতবোমা' (২০১৭), 'কবির স্বপ্ন জ্বলে সাপের মাথায়' (২০১৭), 'সকল বৃক্ষের চুমুক' (২০১৮), 'বৃষ্টি মাতরম' (২০২০)

বিজয় দে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রচলিত বাংলা কবিতার ফর্মটাকে গুরুত্বই দেননি। তাঁর প্রবল এন্টিএস্টাবিলিশমেন্ট সেন্টিমেন্ট কবিতাকে কলাকৈবল্যবাদের যাবতীয় সরল ও জটিল অবয়ব থেকে মুক্ত করে তুলেছে। 'হে থুতু হে ডাকটিকিট হে অরণ্য', 'কাঠুরিয়া আন্তর্জাতিক', 'বম্বে টকি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের বয়ানে বিষয় ও রীতি কোনোকিছুই পরিসরের বন্ধনীতে আবদ্ধ নয়। আখ্যানের সময়, সিকোয়েন্স, শৈলী ও কথনরীতির সুনির্দিষ্ট নর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে কবিতাকে শুধুমাত্র অক্রিয়াশীল বা নন পারফরমিং আর্ট করে তুললেন। দার্শনিক তত্ত্বে নয়, রাজনীতির উত্তাপে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতায় নয়, কেবলমাত্র চেতন ও অবচেতনের, শব্দ ও নৈঃশব্দের, অবতল ও উপরিতলের দৃশ্যমানতা আর শ্রাব্যতাকে ব্যবহার করে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন বাচনকে। 'হে থুতু হে ডাকটিকিট', 'কাঠুরিয়া আন্তর্জাতিক', 'বম্বে টকি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কথা এপ্রসঙ্গে মনে আসে।

সমর রায়চৌধুরীর (১৯৫২) সাতের দশকের শেষ দিক থেকে কবিতাচর্চার শুরু। তাঁর সম্পাদিত কবিতার কাগজ 'ক্রুসেড'। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— 'পাখিবাজার' (১৯৮১), 'নিশিডাক' (১৯৮৬), 'মেঘওয়ালা' (১৯৯৯), 'লোহালক্করের তরকারি' (২০০৪), 'সপ্তমীর সকাল' (২০১৫), 'পাখির দুধ'

(২০১৬), 'আমি গীতবিতানের নাগরিক' (২০১৮), মোহামেডান স্পোর্টিং' (২০১৯), 'বটতলার বই' (২০২০) ইত্যাদি।

সাতের দশকের রণক্লান্ত দিনগুলি অতিবাহিত হলে আটের দশকে উত্তরের কবিতাভূমিতে বিরাজ করে এক গভীর শূন্যতা। এই দশকের কবিরা খুঁজে পেতে চান শেল-বারুদের গন্ধহীন কোনো নতুনভূমি। কেননা ইতিমধ্যে সাতের দশকের অবসান ঘটেছে ভাতৃঘাতি হত্যা, অবসাদ আর বিষণ্ণতায়। সমর রায়চৌধুরী কবিতা তাই সামাজিক অস্থিরতার বদলে মানসিক স্থিতিহীনতার রেখাচিত্রকে অঙ্কন করেছে। তাঁর কবিতায় বিশেষত 'পাখিবাজার', 'নিশিডাক', 'মেঘওয়ালা' ইত্যাদি কাব্যে নন্দনতত্ত্বের বহুকৌণিক জটিলতার জন্ম দিয়েছে। সাতের দশকের মতো নির্দেশাত্মক বার্তার পথ পরিহার করে কবিতায় বহুমাত্রিক দ্যোতনার সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে পারিপার্শ্বিক মূল্যায়নের বদলে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষকে স্থাপন করে বস্তুবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন স্বর নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখা গেল তাঁর কবিতায়। পূর্ববর্তী দশকগুলিতে প্রকৃতির কোনো স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেখানে আটের পরবর্তী কবিতায় প্রকৃতি স্বয়ং প্রতিশোধস্পৃহার আকাঙ্ক্ষায় অবতীর্ণ হলো। সমর রায়চৌধুরীর কবিতায় প্রকৃতি চেতনা এসেছে একেবারে ভিন্নরূপে। তিনি মানুষ ও প্রকৃতিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখেছেন। যুযুধান দুপক্ষের ল'ড়াইয়েমানুষই ক্রমাগত জয়লাভ করেছে। যেভাবে মানুষের হাতে নির্বিচারে ধ্বংস হয়ে চলেছে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, আধুনিকোত্তর সময়ে দাঁড়িয়ে তাই কবিকে লিখতেই হয়—

"মাছের বাজারে বড় বড় আঁশবঁটিগুলির সাথে আমার দ্যাখা হয় রোজ
বরফের টুক্‌রীর ভেতর সাদা ও শীতল ধোঁয়ার থেকে
এক একটি হিম চিংড়ি মাছ মৃত চোখ দিয়ে আমাকে ডাকে
ডাকে ল্যাংড়া আম, লিচু, পাঁঠার মাংস আর টমেটো ডাকে"[২]

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মানুষের লোভ তার আত্মরতি আজ প্রকৃতির প্রধান শত্রু ,হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের তৈরি শিল্প,সংস্কৃতিচর্চা-সাহিত্য- প্রেম প্রকৃতি ও-সৌন্দর্যচিন্তা অসাড় প্রমাণিত হচ্ছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাছে। এইসব বিমূর্ত মানবিকী ভাবনাগুলির যদি কোন প্রয়োগিক দিক থাকতো তবে নিশ্চয়ই প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আটকানো সম্ভব হতো। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত সেরকম কোনো উদাহরণ নেই আমাদের কাছে। যেন মনে হয়, মানুষের শিল্প সংস্কৃতিচর্চা আসলে প্রকৃতির-সাহিত্য-ক্ষতে পেলবতা মাখানোর ভণ্ড প্রচেষ্টা। প্রকৃতির ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখে শিল্পসাহিত্যচর্চা আসলে -ঔপনিবেশিক কায়দায় তার কালো মুখটিকে সুশ্রী দেখানোর একটা অপচেষ্টা মাত্র। মর্মান্তিক সেই ধ্বংস যজ্ঞ ক্রমাগত বিপন্ন করে তোলে কবিকে—

"বেজে উঠছে পাথরের বুকের ভেতর ব্যথার জঙ্গল
রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে ডেকে উঠছে এক ঝাঁক টিয়া ও ডাহুক
বেজে উঠছে বন মুরগীর পায়ে ও ডানায় লাল কামনার উদ্ভাস
আকাশ-করাতের নীচে নেই কোনো দেবী ও দেবতা"[৩]

তাই মানবের নিসর্গ প্রীতি, প্রেম-প্রকৃতি জাতীয় চিরাচরিত ভাবনাগুলিকে কবি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান। তখন মনে হয় মানুষের যাবতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা নিঃস্বার্থপূর্ণ নয়। তাই প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যুযুধান দুই পক্ষের যুদ্ধে তিনি প্রকৃতির পক্ষই অবলম্বন করেছেন। কামনা করেছেন প্রকৃতির জয়লাভ। প্রকৃতি তাঁর কবিতায় সমরাস্ত্রে সজ্জিত প্রতিশোধমুখর এক সামরিক যোদ্ধা। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কবিতাংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

১. “কোথাও একটা চাকা ঘুরে ওঠে
আর ঘিঞ্জি শহর একদম সাফ হয়ে যায়”[৪]

২. “গাছের তল দিয়ে হেঁটে গেলে হাত পা ক’রে ওঠে শিরশির
ডালপালা ঝুঁকে পড়ে চাপ দেয় গলার ওপরে
গাছের দিকে তাকাতে পারি না আর”[৫]

৩. “সে শুকনো পাতার চিৎকার
পাথরের অজ্ঞান ও ফ্রিজের মধ্যে ব্লাস্ট ফার্নেসের তাণ্ডব
ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মাথার ভিতরে
আর সারাক্ষণ আমার রক্তের সাথে কথা বলে তার রক্ত
ভয় দ্যাখায় আমাকে বলে;
একদিন গাঢ় অভিমানে সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবে সূর্য”[৬]

এইভাবে প্রকৃতি সমর রায়চৌধুরীর কবিতায় চারিত্রিক ভূমিকায় তার প্রতিশোধস্পৃহা পালন করে চলেছে। প্রকৃতি ও মানুষের এই অসম যুদ্ধে কবি কল্পনায় মানব সভ্যতা ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে— এর জন্য কবির মনে কোনো খেদ নেই। উত্তর আধুনিক এই কবিভাবনা প্রকারান্তরে হয়ে ওঠে জীবনের প্রতি গভীর সতর্কবার্তা।

‘পাগলাঘোড়া’ ও ‘ক্রুসেডে’র হাত ধরে বাংলা কবিতার জগতে পদার্পণ শ্যামল সিংহের (১৯৪৯-২০০৩)। আটের দশকের এই কবির জন্ম জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়িতে। তাঁর প্রথম কবিতা ‘আছি’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ ‘পাগলাঘোড়া’ ১ম সংকলনে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— ‘চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা’ (১৯৯১), ‘সূর্যাস্ত আঁকা নিষেধ’ (২০০১), ‘জেগে উঠছেন বাঘাযতীন’ (২০০৩)। কবি শ্যামল সিংহ যে কাব্যশৈলী নির্মাণ করলেন তা পূর্বাপর সমস্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কবিতার মেদহীন কায়া নির্মাণ করলেন। এ প্রসঙ্গে জাপানী হাইকু কবিতার কথা মনে পড়ে। তবে জাপানী হাইকুর মতো ততখানি সংক্ষিপ্ত না হলেও দুই থেকে আট চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথচ গভীর ব্যঞ্জনাবহ কবিতার সংহত রূপ সত্যিই বাংলা সাহিত্যে বড়ো প্রাপ্তি। বস্তুজগতের উপাদান সমূহের মধ্যেকার ভাষা ও চিহ্নের আন্তঃসম্পর্ক এবং শব্দের নিহিতার্থ আবিষ্কার ও তাকেই অবলম্বন করে বাচনকে বহুমাত্রিক করার প্রয়াস লক্ষ করা গেল শ্যামল সিংহের কবিতায়। প্রাসঙ্গিক একটি কবিতাংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

“সেতুর কাছে আমি রেখেছি পাটিগণিতের প্রস্তাব
পলাশের জটিলতায় খাচ্ছি রাস্তার ভুলভাল
দুধের কাছ থেকে মাইল মাইল দূরে আছি
পেরেক নিয়ে তো তেমন আলোচনা হল না কোনোদিন”[৭]

‘সেতু’= রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ‘পলাশের জটিলতা’= বহুদলীয় রাজনীতি, ‘দুধ’= উন্নয়ন, ‘পেরেক’= সংযোগকারী। কবিতাটিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ ধ্বনিত হয়েছে। ‘সেতু’ এখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। যিনি রাষ্ট্র এবং ভোটারের মধ্যে সংযোগের সেতু রূপে কাজ করেন। ‘পলাশের জটিলতা’ মানে বহুদলীয় রাজনৈতিক জটিলতায় সৃষ্ট গোলকধাঁধা। যার ফলে জনগণ ‘দুধের কাছ থেকে’ অর্থাৎ প্রকৃত উন্নয়ন থেকে শতহস্ত দূরে রয়েছেন। ‘পেরেক’ এখানে সেই লৌহখণ্ড যা রাষ্ট্র ও মানুষকে দৃঢ়তার সাথে জুড়ে রাখে, তা নিয়ে কখনো চর্চাই হলো না আমাদের দেশে।

প্রকরণবাদী সাহিত্য সমালোচকেরা মনে করেন সাহিত্য আসলে একটি 'কোড' অতএব তাকে ডি-কোড করাটাই সাহিত্য সমালোচনার লক্ষ। সস্যুরও মনে করতেন রচনা আদতে এক চিহ্ন ব্যবস্থা। চিহ্নগুলির পারস্পারিক বিন্যাস এবং তাদের মধ্যেকার বৈপরীত্য নির্মাণ করে রচনার সংগঠন। আধুনিকোত্তর চিহ্ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্ম সস্যুরের তত্ত্বাদর্শ থেকে। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সস্যুর দুটি সূত্র উত্থাপন করেছেন। প্রথমটি 'লাঙ্' এবং 'পারোল' তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টি 'দ্যোতক' (Signifier) ও 'দ্যোতিত' (Signified) তত্ত্ব। সস্যুর মনে করেন ভাষা হলো চিহ্নের (Sign) সংস্থান। চিহ্নগুলি হলো স্বেচ্ছাচারী (Orbitrary) এবং বৈপরীত্যমূলক (Constrastive)। ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ হলো এই চিহ্নসমূহের বিন্যাস বিশ্লেষণ করা। তিনি আরো বলেন যে অর্থ আসলে আরোপিত কোনো মূল্যমান নয়, চিহ্নের বিন্যাস এবং বৈপরীত্যই এর অর্থ গড়ে তোলে। অবয়ববাদী সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা সস্যুরের এই ভাবনার প্রয়োগ ঘটান সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। ফলে সাহিত্যের বয়ান ও লেখক নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র সংস্থান হয়ে ওঠে।[৮]

আপাতভাবে শ্যামল সিংহের কবিতার ভাষা দৈনন্দিন কেজো গদ্যের ভাষা, লিখিত গদ্যের সাথে নেই বিস্তর কোনো ফারাক। আমাদের প্রথাগত কাব্যপাঠের ধারণায় শ্যামল সিংহের কবিতার বিশেষত্ব ধরা যাবে না। একটু সচেতনভাবে দেখলে বোঝা যায় এই ভাষার ভেতরে যে সংকেত লুকিয়ে আছে তাতেই কবিতাগুলি অর্থবহ হয়ে উঠছে। শ্যামল সিংহের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী কীভাবে চিহ্নায়ক মূল্যমান নির্ধারণ করছে তা দুএকটি প্রাসঙ্গিক কবিতার মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে—

"ব্ল্যাকবোর্ড থেকে উড়ে গেছে পাখি
আমরা জুতো ছুঁড়ছি স্বর্গের দিকে
শূয়োরের সমীকরণে না গিয়ে
আমরা অনুবাদ করছি দেবতা
ডিমের ভেতর ঘুমিয়ে আছেন সন্ন্যাসী
মাফলার খুললেই ব্লটিং-পেপার
ব্লটিং-পেপারে বাসি রক্ত"[৯]

'ব্ল্যাকবোর্ড' অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কখনোই প্রকৃত শিক্ষা দেয়নি। আমাদের শিক্ষায় পাখিও নেই, মুক্তিও নেই। সেই শিক্ষায় আমরা যাবতীয় সনাতনী মূল্যবোধগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ফলে আমাদের সৃষ্টি প্রকৃত দেবতা নয়, দেবতার অনুকরণ হচ্ছে মাত্র। কবি এই ঘটনাকে জীবনানন্দ দাশের মতো শূয়োরের সহজ সমীকরণ মানতে রাজি নন। অন্যদিকে বর্তমান সমাজে প্রত্যেকটি মানুষ মুখোশধারী, যার ভেতরে লুকিয়ে আছেন একেকজন ভণ্ড সন্ন্যাসী। মুখ খুললেই যার ভেতর থেকে বেড়িয়ে পড়ছে শোষকের চিহ্ন। সমাজের সর্বত্রই সেই চিহ্ন বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গেই আরেকটি কবিতার উল্লেখ করছি—

"কুড়ালের মতো একা, উলঙ্গ দোলনায় আমি দুলছি
ছুটে যাচ্ছে রং-বেরংয়ের স্যুটকেস
আমার খাটে ছড়িয়ে পড়ছে স্যুটকেসের অসুখ
আমি কীভাবে বাজাবো তোমার চোখের জল
প্রদীপের কূটচালে নিহত খড়মের শ্লোক"[১০]

এখানে কবিতাটির যে মানে দাঁড়াচ্ছে তা হলো বর্তমান পণ্যসর্বস্ব পৃথিবীতে কবি একা হয়ে পড়ছেন। তার প্রেমেও নেই কোনো আবরণ। চারপাশে ছুটে চলছে নানা রঙের ভোগলিপ্সা। কবির অন্দরমহলও তার

ব্যাতিক্রম নয়। কবি কীভাবে বোঝাবেন তার প্রিয়তমাকে প্রকৃত প্রেমের ভাষা। যেখানে ভোগবাদ মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা করে নিয়েছে। যার ফলে আমাদের চিরাচরিত মূল্যবোধগুলিও নিহত আজ। এইভাবে শব্দগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ধরে ব্যাখ্যা করলে কবিতাটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। সুতরাং ভাষাচিহ্নগুলির পারস্পারিক বিন্যাসে একেকটি কবিতা একেকভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। দ্যোতিতের মনন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর তার ভিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়া নির্মিত হয়। অর্থাৎ রচনার বয়ান (Text) বা লেখক কেউই সাহিত্যকৃতির অর্থ নির্ধারিত করছে না এর অর্থ নির্ধারিত হচ্ছে দ্যোতিতের (পাঠকের) চেতনাবিশ্বে। চিহ্নগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্মাণ করছে তাদের পারস্পারিক বিন্যাসক্রমের উপর।

আটের দশকের উত্তরবঙ্গের অবিস্মরণীয় কবি প্রতিভার নাম বিকাশ সরকার। ১৯৬৫-তে জলপাইগুড়ির গয়েরকাটাতে কবির জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই চরম দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বড়ো হয়েছেন। ১৯৮৩-তে ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'চিঠি পোড়ানো উৎসব' কবিতাটি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৮০-তে 'লাল নক্ষত্র' পত্রিকায়। কবিতা লেখার পাশাপাশি গল্প ও উপন্যাসও লিখে থাকেন। বর্তমানে দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— 'কনিষ্কের মাথা' (১৯৮৩), 'প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য' (১৯৮৫), 'ফাঁসিগাছ' (১৯৮৭), 'কনিষ্কের মাথা ও অন্যান্য কবিতা' (২০০৪), 'জাদুর গহন আখা' (২০০৬), 'গয়েরকাটা সমগ্র' (২০০৭), 'বিষাদ বালক' (২০০৮), 'নির্বাচিত কবিতা' (২০০৯), 'অনন্ত ছুতোর' (২০১০)।

আটের দশকের কবি বিকাশ সরকারের কবিতায় উত্তর আধুনিক শূন্যগর্ভ ভাবনা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। যেখানে বিশৃঙ্খল, উৎকেন্দ্রিক, যুক্তিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলি নানাভাবে গ্রথিত। ফলত কোনো প্রথাগত ফর্মে আবদ্ধ থাকেনি বিকাশ সরকারের কবিতা। ভাষা, শব্দ ও অন্বয়ের ভিন্নমুখী বিন্যাসে গড়ে উঠতে থাকে বিকাশ সরকারের নিজস্ব ডিসকোর্স। আটের কবিদের সৃজনশীল মননবিশ্ব কীরকম গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে বিকাশ সরকারের কবিতায়। এখানে একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হলো—

> "ভেবেছিল র‍্যাঁবো হবে, হয়েছে বত্রিশে সে ছাপোষা বাঙালি
> ঘোড়ায় চেপে চলেছেন নেতাজি সুভাষ, এ-দৃশ্যে স্বপ্ন ছিল
> স্বাধীনতা-উত্তর যুবা, ভেবেছিল যুদ্ধ আছে ঢের এই বুকে
> আছে বুঝি বারুদ ও বন্দুক; সে-গুড়ে দিয়েছে বালি নকশালবাড়ি
> ফলে হাজারটা রাত গেছে ঘুমের বড়ির ভিতর জাগরণে"[১১]

সামাজিক এই বাস্তব সত্যকে স্বপ্নজালের মোহ ছিঁড়ে যে কবি অবলীলায় প্রকাশ করতে পারেন তার কাছে তাঁর কাছে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যবোধ জাতীয় মানবিকী ভাবনাগুলির কোনো মহাকাব্যিক সমগ্রতা আমরা আশা করতে পারি না কখনোই। উত্তর আধুনিক মননবিশ্বে সমগ্রতার তুলনায় ভগ্নাংশই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রেমের খণ্ডিত রূপ, প্রকৃতির বিরুদ্ধময় আচরণ সেখানে আমরা বারেবারে প্রত্যক্ষ করেছি। বিকাশ সরকারের কবিতায় আদ্যোপ্রান্ত একটা রোম্যান্টিক মনন থাকলেও যুগবৈশিষ্ট্যহেতু তার খণ্ডিত রূপই অঙ্কিত হয়েছে। 'কনিষ্কের মাথা' কবিতার কিছু অংশ সেই খণ্ডিত প্রেমভাবনাকে প্রকাশ করেছে বলেই মনে হয়—

> "আমরা দুজন যখন একটা যতিহীন প্রেমের গল্প শুরু করতে যাচ্ছি
> অন্ধকারে ভেসে উঠল কনিষ্কের
> মাথা
> বুদ্বুদের মতো তার চোখ থেকে জোছনার খর বিচ্ছুরণ"[১২]

পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, তথ্যপ্রযুক্তির বিপন্নতার কালে আধুনিকোত্তর প্রেমের এই খণ্ড রূপই চিরন্তন সত্য হয়ে উঠেছে। বিকাশ সরকার, শ্যামল সিংহ বা আটের অন্যান্যদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত তিনজন কবি ছাড়াও আটের দশকে উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক ভাবনাসূত্রগুলি নানাভাবে ক্রিয়াশীল পুণ্যশ্লোক দাসগুপ্ত, অমর চক্রবর্তী, জীবতোষ দাস, সমীরণ ঘোষ, গৌতম গুহরায়, তৃপ্তি সান্ত্রা, অসীম শর্মা, প্রমুখদের কবিতায়। পুণ্যশ্লোক দাসগুপ্তের আধুনিকোত্তর প্রেমের বহুকৌণিক নির্মাণ, অমর চক্রবর্তীর পরিবর্তিত সম্ভাবনাকে গ্রহণ এবং পুরাতনকে আঁকড়ে স্থিতিশীল ডিসকোর্স তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সন্তোষ সিংহের কবিতায় চেতন-অবচেতন সত্তা, জৈবপ্রবৃত্তি, লোক উপদানের মিশেলে অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটগুলি চিত্রিত হয়েছে। জীবতোষ দাস, সমীরণ ঘোষের হাংরি ভাবধারায় জীবনবীক্ষণ, গৌতম গুহরায়ের উত্তরমার্ক্সীয় বীক্ষণরীতি, তৃপ্তি সান্ত্রার নারীবাদী জীবনপাঠের বয়ান, অসীম শর্মার অস্তিত্ববাদী বিশ্ববিক্ষা উত্তরবঙ্গের আটের দশকের কবিতাকে আধুনিকোত্তর শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছে।

নয়ের দশকের উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতা প্রবলভাবে বিপন্নতায় আক্রান্ত। তার বিপন্নতার কেন্দ্রটির একদিকে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া, সাইবার ক্রাইমের দাপটে ব্যক্তিপরিসরের সুরক্ষাহীনতা; অন্যদিকে ভোগবাদ, পুঁজিশক্তি, পণ্যসংস্কৃতি ও বহুজাতিক সংস্থার দাপটে মানুষের কেবলমাত্র খদ্দেরে পরিণত হওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। যার ফলে ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন কোনো কিছুই নিঃসংশয়ে আজ আর তাকে প্রভাবিত করতে পারছে না। ফলত, এযুগের কবিতায় আস্থাহীনতার কথা, বিপন্নতার কথা, অনিকেত যাপনের কথা, নৈঃশব্দের কথাকে ধারণের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা গেল। আবার একথাও চূড়ান্ত নয়। আসলে আধুনিকোত্তর কবিসত্তায় চূড়ান্ত বলে কিছু নেই। তাই অনেক সময়েই দেখা গেল সভ্যতার বিপরীতমুখী গমন। ইতিহাস-সংস্কৃতি-লোকঐতিহ্যের পুরানো পথ ধরে চলনের প্রবণতাও এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। নিখিলেশ রায়, মণিদীপা নন্দীবিশ্বাস, সুবীর সরকার, আবদুস সালাম সমু, দেবজ্যোতি রায়, অভিজিৎ রায়গুপ্ত, অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুশ্রী পাল, ভগীরথ দাস, তপন রায় প্রমুখেরা নানাভাবে কবিতার ভাষাকে বহুমাত্রিক দ্যোতনায় দ্যোতিত করতে চাইলেন।

এর পাশাপাশি আধুনিক তত্ত্ববিশ্বের ধারণাগুলিকেও আত্মস্থ করেছে এই দশকের কবিতা। জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, রলাঁ বার্ত, লেভি ষ্ট্রস প্রমুখ চিন্তাবিদদের ধারণা অধিকার করেছে কবিদের মননবিশ্ব। রলাঁ বার্ত এসে ঘোষণা করলেন লেখকের মৃত্যু, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের পাঠকৃতিতেও টেকস্টই গুরুত্ববহ হয় উঠলো। ফলে কবিতার পাঠকৃতিতে গড়ে উঠলো ভিন্নধর্মী বয়ান। সোস্যুর লাঁগ এবং পারোল; দ্যোতক ও দ্যোতিতের যে ধারণা উপস্থাপন করলেন তা সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রের পাশাপাশি সৃজনক্রিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো। জাক লাকাঁর বিচ্ছিন্নতার দর্শন, মিশেল ফুকোর চিন্তার জগৎ, জাঁ বদ্রিলার পণ্যায়নের ধারণা, জাক দেরিদার বিনির্মাণের তত্ত্ব, নোয়াম চমস্কির বিশ্বজনীন ভাষাতত্ত্ব আধুনিক মননে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাসূত্রগুলিকে জাগ্রত করলো। ফলে নয়ের দশকের উত্তরবঙ্গের কবিতা পোস্টমর্ডানের বহুব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে চললো। সংজ্ঞা ও শৈলীর নির্ধারিত ফর্মকে অস্বীকার করে বহুস্বরিক হয়ে উঠলো উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতা।

তথ্যসূত্র:

১. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি জেলা কবিতা সংখ্যা, আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), দিবারাত্রির কাব্য, সপ্তদশ বর্ষ, ২০০৯, পৃ. ১০৫

২. সমর রায়চৌধুরী, পাখিবাজার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জলপাইগুড়ি, ১৯৮১, পৃ. ২৮

৩. তদেব, পৃ. ১৫

৪. তদেব, পৃ. ১৯
৫. তদেব, পৃ. ২৪
৬. তদেব, পৃ. ১৫
৭. শ্যামল সিংহ, নির্বাচিত শ্যামল সিংহ, এখন বাংলা কবিতার কাগজ, জলপাইগুড়ি, ২০১৪, পৃ. ২০
৮. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬২-১৬৫
৯. শ্যামল সিংহ, নির্বাচিত শ্যামল সিংহ, এখন বাংলা কবিতার কাগজ, জলপাইগুড়ি, ২০১৪, পৃ. ২৭
১০. তদেব, পৃ. ২৫
১১. বিকাশ সরকার, শ্রেষ্ঠ কবিতা, স্রোত প্রকাশনা, ঊনকোটি, ত্রিপুরা, ২০১৬, পৃ. ৪৭
১২. তদেব, পৃ. ১৯